কমিউনিস্ট ইস্তেহারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখার উত্তরে

সম্প্রতি মার্কস-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ইস্তেহারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একটা লেখা অনলাইনে নজরে আসে। পার্থবাবু পণ্ডিত মানুষ, তাই আগ্রহভরে লেখাটি পড়ে ফেলি। পড়তে পড়তে খটকা লাগে, মার্কস-এঙ্গেলস ইস্তেহারে কী কী বলতে পারেননি, তাঁদের লেখাপত্রে কোন কোন দিকে ফাঁক রয়ে গেছে আর তাঁদের কোন কথাগুলো বাস্তবে ফলেনি, তার ফিরিস্তি দিতেই লেখকের আগ্রহ। কিন্তু কেন? কমিউনিস্ট ইস্তেহার এবং গবেষনাসমৃদ্ধ বহু গ্রন্থের মাধ্যমে মার্কস-এঙ্গেলেস সেসময়ে উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজ-অর্থনীতির ওপর অন্তর্ভেদী আলো ফেলেছিলেন, যা পুঁজিবাদের চোখ-ধাঁধানো অগ্রগতির পেছনে বিপুল-অধিকাংশ মানুষের নিঃস্বকরণের প্রক্রিয়াটাকে বুঝে নিতে, এবং তার ভেতরের স্ববিরোধগুলো চিনে নিতে দুনিয়ার মানুষের কাছে পথ-প্রদর্শক ভূমিকা নিয়েছে বলেই জানতাম। আজকের দিনে বিশ্বজুড়ে পুঁজির আগ্রাসী চরিত্র সেই প্রক্রিয়াকে আরো তীব্র করে শুধু মানব-শ্রমই নয় প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারকেও নিংড়ে নিয়ে কিভাবে সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে, তাও তো চোখের সামনে উন্মোচিত। এই প্রেক্ষিতে মার্কস-এঙ্গেলস পুঁজিবাদ-উত্তর এক সমাজের খোঁজে যে ইস্তেহার রচনা করেছিলেন, তা কী একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক?

উক্ত লেখায় পার্থবাবু কমিউনিস্ট ইস্তেহারের মধ্যে সেটুকুই ‘ঐতিহাসিক গুরুত্ব’ খুঁজে পেয়েছেন, যা শুধুমাত্র উনিশ-বিশ শতকের নানা ঘটনা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে, আর কিছু নয়। ‘নানা ঘটনা’ বলতে ঠিক বোঝালেন তিনি, স্পষ্ট হলনা। আর বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক যেসকল ব্যাখ্যার জন্য মার্কস-এঙ্গেলস দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের কাছে সমাদৃত, সেসবও কীভাবে কবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল---তাও বোঝা গেল না।

আমি আমার পুরনো কিছু বন্ধুকে (আমারই মতন যাদের জীবনের একটা বড় সময় কেটেছে মার্কস নিয়ে দিনযাপন করে) লেখাটা পড়ার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তাদের একজন প্রশ্ন করল, আচ্ছা উনি হঠাৎ এই সময়ে লেখাটা লিখলেন কেন। আজকের সময়ে এই দেশে ‘মার্কস প্রাসঙ্গিক কিনা’ এই প্রশ্ন উত্থাপন কতটা জরুরী, যখন মার্কস নামাংকিত দলগুলির চূড়ান্ত দেউলিয়া রাজনীতির সুবাদে ধর্মীয় ফ্যাসীবাদ আমাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে! সত্যি বলতে কি, সেটাও বোঝা গেলনা। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, পণ্ডিতরা কলম ধরলে কিছু শেখার আশা করি, কিন্তু পার্থবাবুর এই লেখাটা পড়ে সব কেমন গুলিয়ে গেল। তাই আবার কমিউনিস্ট ইস্তেহার আর খানিক মার্কস পড়ে ফেললাম। আর তারই ফলাফল এই লেখা।

ইস্তেহারের উদ্দেশ্য

কমিউনিস্ট ইস্তেহার লেখার উদ্দেশ্য ইস্তেহারের পাতাতে মার্কস-এঙ্গেলস এইভাবে উল্লেখ করেছিলেনঃ *আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্যভাবে আসন্ন অবসানের কথা ঘোষনাই ছিল কমিউনিস্ট ইস্তেহারের লক্ষ্য।* স্পষ্টতই, নিছক কেতাবি আলোচনা বা চর্চার জন্য নয়, তাঁরা ইস্তেহার রচনা করেছিলেন বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসান এবং সাম্যবাদী ব্যবস্থার সূচনা, এ দুইই যে অনিবার্য তা মানবসমাজের কাছে ঘোষনার জন্য। তাদের এই ঘোষনার পেছনে কোনো কল্প-স্বর্গ নির্মাণের অভিপ্রায় ছিলনা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের গতি-প্রকৃতির পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ থেকেই তাঁরা এই পূর্বানুমান করেছিলেন। বিপুল দারিদ্র আর প্রতিকূলতার মধ্যেও মার্কস তাঁর মেধাশক্তি বুর্জোয়াদের কাছে বিক্রি না করে বুর্জোয়া ব্যবস্থার স্ববিরোধ উন্মোচনে নিরলস গবেষনা চালিয়ে গিয়েছিলেন, এতো সবারই জানা।

মার্কসের মৃত্যুর পর গত দেড়'শো বছর মানবসমাজ বিশাল বিশাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, বহু উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকল্প নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও খুব কম হয়নি। তাতে সাফল্য বেশি এসেছে না ব্যর্থতা, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, বুর্জোয়া ব্যবস্থাই যে শেষ কথা নয়, এটা বোধহয় প্রতিষ্ঠা করা গেছে। প্রায় গোটা বিশ শতকজুড়ে একের পর এক দুনিয়া কাঁপানো বিপ্লব-বিদ্রোহ পুঁজিবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে, বুর্জোয়াদের প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছে। এইসব উথাল-পাথাল করা মুক্তিকামী জনতার গণ-জাগরণে আদর্শগত প্রেরণা যুগিয়েছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে সবার আগে উচ্চারিত হবে মার্কস-এঙ্গেলেসের নাম। *এতদিন দার্শনিকরা দুনিয়াকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে এসেছেন, আসল কথা হলে তাকে পালটানো,* মার্কসের এই বিখ্যাত উক্তি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিপ্লব-বিদ্রোহের ধারা অব্যাহত রেখেছে। তাই আজো সারা দুনিয়ার বুর্জোয়া শাসকরা যেকোন প্রতিবাদী আন্দোলনে কমিউনিজমের ভূত দেখে, ভারতে প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবিদের 'শহুরে নকশাল' তকমা জোটে আর ট্রাম্প সাহেব বর্ণ-বিদ্বেষ বিরোধী সংগ্রামে র‍্যাডিকাল রাজনীতির ভূত দেখে।

সন্দেহ নেই, প্রথম রাউন্ডের লড়াই-এ জয়লাভের সুবাদে বুর্জোয়া ব্যবস্থা এই মূহুর্তে প্রায় দুনিয়াব্যাপী শোষন-লুণ্ঠনের জাল বিস্তার করে এবং নিত্য-নতুন প্রযুক্তি-নির্ভর পণ্য-বাজারের প্রসার ঘটিয়ে বহালতবিয়তে টিকে আছে। আর এই আপাত-স্থিতাবস্থা সাধারণ মানুষ থেকে পণ্ডিত ব্যক্তি অনেকের মধ্যেই এমন ধারণা তৈরি করেছে যে, এই ব্যবস্থার বুঝি বিকল্প নেই। মাও-উত্তর চিনের শাসকদের প্রায় খোলাখুলি পুঁজিবাদী পথে প্রত্যাবর্তন এবং সোভিয়েত

ইউনিয়নের পতনের পর উল্লসিত বুর্জোয়া শিবির বিশ্বজুড়ে এই ধারণা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে, There is no alternative, সংক্ষেপে টিনা, যার মূল কথা বাজার অর্থনীতির কোনও বিকল্প নেই। পার্থবাবুর লেখাটা পরে ধন্দ হল, তিনিও কি সেই কথাই বলতে চাইছেন?

সমস্যা হল, মার্কস-এঙ্গেলস যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষনের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের অনিবার্যতা ঘোষনা করেছিলেন, আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোন আলোচনা না করেই পার্থবাবু একপ্রকার তা নাকচ করে দিয়েছেন। কথায় বলে, 'Proper diagnosis is half the cure'. মার্কসের তাত্ত্বিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ব্যাধি নির্ণয় করা। পার্থবাবু যেটা করেছেন তা হল, পুঁজিবাদের ব্যাধি নিরসনে মার্কস-কথিত দাওয়াই-এর সার্থকতা-ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতা বিচার করেছেন, তাও আজকের সময়ে ভারতের 'বামপন্থী রাজনীতির' প্রেক্ষিতে। মার্কসীয় দর্শনের প্রধান কথাই হচ্ছে দুনিয়ার সবকিছুই অনিত্য, চিরন্তন সত্য বলে কিছু হয়না, যেকোন বস্তু বা সমাজকে অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। তাই মার্কসের নিদান অনুযায়ী বিশ শতকের বিপ্লবগুলো সংঘটিত হয়নি, কৃষকের বিপ্লবী ভূমিকা মার্কস অস্বীকার করেছেন, এসব কথার কোন মানে হয়না।

বিশ শতকের যাবতীয় কৃষক বিপ্লবের পেছনে মার্কসের শিক্ষা কাজ করে গেছে, তার স্বীকৃতি তো সেইসব বিপ্লবের নেতারাই দিয়ে গেছেন। তা নাকচ করে দেবার অধিকার আমাদের কে দিল? মার্কস সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে কৃষকদের যে ভূমিকার কথা বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তা খাটবে কেন! এসব নিয়ে বিতর্ক তুলতে হলে দীর্ঘ আলোচনায় নামতে হয়, স্বল্প পরিসরে খানিক হালকাচ্ছলে সমাজ-বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষকের ভূমিকা নিয়ে মার্কস কী বলেছেন, আর স্থান-কাল অনুযায়ী তা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তা কি আলোচনা করা সম্ভব? পার্থবাবুর মতন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তা করতে গেলেন কেন জানিনা। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থার নাড়ি বোঝার কাজে মার্কস যে বদ্যিগিরি করেছিলেন, তা আজকের দিনে অচল হয়ে গেছে, একথা কি তিনি বলতে চাইলেন! জানিনা। কিন্তু মার্কস-চর্চার অনভ্যাসে এমনটা অনেকের মনে হতেই পারে। তাই সে প্রসঙ্গ একটু ঝালিয়ে নিলে মন্দ কী!

দুনিয়া বদলাতে হলে

প্রথম যৌবনে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হওয়ার সময় একটা কথা খুব বলতাম, হয় তুমি দুনিয়াকে বদলাও, নয়তো দুনিয়া তোমাকে বদলে দেবে। আমাদের হয়েছে সেই দশা। দুনিয়া বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে জীবন শুরু করে পথ গেছে হারিয়ে। কিন্তু দুনিয়া বদলাবার স্বপ্ন যে দেখা যায়, সেই দুঃসাহস তো মার্কস-এঙ্গেলসই আমাদের দিয়েছিলেন। মার্কস বলেছিলেন, শুধু ব্যাখ্যা

করলে হবেনা, বদলাতে হবে। আমরা ভাবলাম, ব্যাখ্যা তো অনেক হল, এবার বদলাতে হবে। কিন্তু দুনিয়া তো পরিবর্তনশীল। তাই দুনিয়াটা আমাদের চোখের সামনে বদলে গেল, আর দুনিয়া আমাদের মতো করে বদলাবে এই আশায় আমরা হাপিত্যেশ করে বসে রইলাম।

তথাকথিত বামপন্থীরা বুদ্ধিমান, তারা আগেভাগেই হাল ছেড়ে দিয়ে চলতি ব্যবস্থার ছকে নিজেদের মাপসই করে বদলে নিলেন। আর বিপ্লবীরা সেই কবেকার চিনা-ছকে বিপ্লব করার আশায় গভীরতর জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। এই অবস্থায় বাম ও বিপ্লবী রাজনীতির সমর্থকদের বড় অংশের কাছেই দুনিয়া বদলানোর স্বপ্নটা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে উঠল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। দুনিয়া ব্যাখ্যার কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের আশপাশের সমাজ কীভাবে বদলে চলেছে, কেমন বিরোধ পেকে উঠছে তার গর্ভে, তার খবর রাখাও তো আমরা কবেই ছেড়ে দিয়েছি।

একটা উদাহরণ দিই। ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে সপ্তমবার ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পর সকলে যখন ধরেই নিয়েছিল এই সরকারকে আর বদলানো যাবেনা, তখন ঠিক তখনই প্রথমে সিঙ্গুর আর পরে নন্দীগ্রামের আন্দোলন হাওয়া ঘুরিয়ে দিল। পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন আর তার পেছনে বিপুল জনসমর্থন প্রবল প্রতাপশালী বাম শাসকদের পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নিল। এরকম এক অবস্থায় ২০১১-র নির্বাচনের ক'দিন আগে কলকাতার সেরা সমাজ বিজ্ঞান গবেষনা কেন্দ্রে গিয়ে দেখলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কিছু শিক্ষক তখনও বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ফিরে আসার স্বপ্নে মশগুল।

বস্তুত, এদেশে সমাজ-বিপ্লবীরা যেমন সমাজ-গবেষনার ধার ধারেন না, তেমনি সমাজ-গবেষকরা আম-জনতা থেকে লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করেন। সামাজিক আলোড়ন-আন্দোলন উভয়ের কাছেই অধরা থেকে যায়। তাই প্রশ্ন জাগে, পার্থবাবু কাদের জন্য কমিউনিস্ট ইস্তেহারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে লিখতে বসলেন? সংসদীয় বামপন্থীদের কথা তো যত কম বলা যায় ততই ভাল। বুর্জোয়া শাসন-ব্যবস্থার অংশীদার হওয়ার পর মার্কসের প্রাসঙ্গিকতা তো কবেই হারিয়ে গিয়েছে তাদের জীবন-মনন থেকে! মুখ ফুটে সেকথা বলার সাহস অবশ্য তাঁদের নেই। পার্থবাবু কি তাঁদের সে সাহস যোগাতে চাইলেন! তাঁদের গা থেকে মার্কসের নামাবলীটা খুলে ফেলার পরামর্শ দিলেন!! সেটা অবশ্য মন্দ হয় না।

যাই হোক, এই সুযোগে আমার মতন মুখ্যু মানুষও খানিক মার্কস-চর্চার অধিকার পেল, সেজন্য পার্থবাবুকে ধন্যবাদ। দেখা যাক আজকের ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে মার্কস-এঙ্গেলস কিছুমাত্র প্রাসঙ্গিক কিনা?

পুঁজিবাদ কোথায় নিয়ে চলেছে?

মার্কস-এঙ্গেলসের মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি মানুষকে তাঁদের পূর্বতন জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে, সকল সম্পদের মালিকানা অল্প কিছু ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত করে এবং সমাজের বাকি সকলকে পরিণত করে তাদের মজুরী দাসে। মুখে মুক্ত বাজার মুক্ত বানিজ্যের কথা বললেও কার্যত এই ব্যবস্থায় বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খায়, বৃহৎ মালিকানা ক্ষুদ্র মালিকানাকে হয় উচ্ছেদ করে, নাহয় অধীনস্থ করে রাখে। বহুজাতিক শিল্প-বানিজ্যের কাছে হার মেনে পাততাড়ি গুটায় দেশি ছোট-মাঝারী এমনকি অনেক বৃহৎ কারবারিরাও। পুঁজির অবিরাম পুঞ্জিভবন এবং কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়া ব্যবস্থা নিজেই নিজেকে খন্ডন করে চলে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি আর উদার গণতন্ত্রের যে গালগল্প দিয়ে তার যাত্রাশুরু, অচিরেই একচেটিয়া শিল্প-বানিজ্য আর দুনিয়াব্যাপী আধিপত্য তার টিকে থাকার শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। আজকের দিনে লগ্নীপুঁজির কেরামতিতে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ক্রমাগত অল্প কিছু কর্পোরেট সংস্থার দখলে চলে যাচ্ছে, আর সেই আধিপত্য নিষ্কণ্টক করতে ট্রাম্প আর মোদির মতো শাসক দরকার পড়ছে, একথায় তো আর কোন ঢাক-ঢাক-গুড়গুড় নেই।

অন্যদিকে, মার্কস-এঙ্গেলস বললেন, বুর্জোয়া ব্যবস্থা মানব-সমাজের প্রয়োজনীয় সকল ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন ও বন্টনে গোটা সমাজকে জড়িয়ে ফেলে। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ঘটে যা কিনা উত্তরোত্তর কেন্দ্রীভূত মালিকানা ব্যবস্থার সাথে এক মীমাংসাহীন দ্বন্দ্ব তৈরি করে। তৈরি করে সমাজজুড়ে, দেশজুড়ে, বিশ্বজুড়ে সংকট, যার একমাত্র সমাধান বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসান এবং সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর সামাজিক মালিকানা কায়েম করার মধ্যে দিয়েই মিলতে পারে।

মার্কস-এঙ্গেলস তখনকার বুর্জোয়া সমাজের গভীরে ক্রমশ ঘনীভূত এই সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, এর পরিণতি আজ নাহয় কাল বুর্জোয়া সমাজের অবসান ঘনিয়ে তুলবে, মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে পুরনো আর পাঁচটা সমাজব্যবস্থার মতো বুর্জোয়া ব্যবস্থাও একদিন ইতিহাসে পরিণত হবে। সেই সংকটের কি নিরসন হয়েছে? মানুষে-মানুষে বৈষম্য, বিভেদ, দমন-পীড়ণ কি এতটুকু কম হয়েছে? আম-জনতার জীবন-জীবিকার সংকটের কথা ছেড়েই দিলাম, আজ একটা প্রজাতি হিসেবে মানব-সমাজের অস্তিত্বই কি সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ছে না? বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে কি এই সমস্যা-সংকটের নিরসন তো দূরের কথা প্রশমনও কি সম্ভব? ইদানিং বুর্জোয়া গবেষনা-প্রতিষ্ঠানে প্রশমন কথাটাই উচ্চারিত হচ্ছে, কারণ সবাই ধরেই নিয়েছে নিরসন সম্ভব নয়। কিন্তু সংকটের বাড়বাড়ন্ত তাতে আটকাচ্ছে কই!

এখানেই মার্কস বুর্জোয়াদের দুচোখের বিষ, কেননা তিনি এই সংকটের জড় খুঁজে বের করেছিলেন, আর সংকট নিরসনে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার কথা বলেছিলেন। সেকাজ যে শুধু শ্রমিকরাই করবেন এমন কথা তিনি বলেননি। বলেছেন পুঁজির সাথে সমগ্র মানবসমাজ কীভাবে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে সেকথা। কারণ, শুধুমাত্র কল-কারখানার মজুররাই মজুরী-দাসত্ব করছেন তাতো নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সকল ধরণের পেশাকেই মজুরী-দাসে পরিণত করে। ইস্তেহার বলছে,

> *মানুষের যেসমস্ত বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণি তাদেরও মাহাত্ম ঘুঁচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী---সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরীভোগী শ্রমজীবি হিসেবে।*

এই কারণে শুধু শিল্প-শ্রমিকই নয়, সকল পেশার মানুষের সাথেই বুর্জোয়া ব্যবস্থার কমবেশি বিরোধ তৈরি হয়, যা সংকটকালে বিভিন্ন পেশাভোগী মানুষের মধ্যে ব্যবস্থা-বিরোধী ঐক্যের ক্ষেত্র তৈরি করে। শুধু নিজেদের দেশে বিভিন্ন পেশার ওপর আধিপত্যই নয়, বুর্জোয়া শ্রেণি আধিপত্য বিস্তার করে তথাকথিত অনুন্নত দেশ আর জাতির ওপর, তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় নিজের ভাবনা। ইস্তেহারে বলা হয়েছে,

> *সকল জাতিকে তারা বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালী গ্রহনে বাধ্য করে, বাধ্য করে সেই বস্তু চালু করতে যাকে তারা বলে সভ্যতা---অর্থাৎ বাধ্য করে তাদের বুর্জোয়া বনতে। এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণি তার নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে।.....*

মার্কস-এঙ্গেলস যে প্রক্রিয়ার শুরু দেখে গিয়েছিলেন, আমরা যেন তারই ফলাফল দেখছি এই ভারতবর্ষে। জোর করে একটা বহু-জাতিক দেশের স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ করে, দেশের ভেতরে ছোট-বড় জাতিসত্বাগুলোর স্বাতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার সাথে তাকে জোর করে জুতে দেওয়ার পরিণতি কী ভয়ংকর হতে পারে, তা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। ইউরোপে পুঁজির বিকাশ জাতিগুলোর স্বাধীন বিকাশের সহায়ক হয়েছিল, আর এদেশের ভিখ-মাঙ্গা স্বাধীনতা আর মেকি গণতন্ত্র ভারতবর্ষকে জাতিগুলোর কারাগারে পরিণত করেছে। ভারতের এই দুরবস্থা বুঝতে একটু আন্তরিক হলে মার্কসের থেকে বড় সঙ্গী আর কে হতে পারেন!!

ভারতের জন্য ইস্তেহার

দেখেশুনে মনে হয়, মার্কস-এঙ্গেলস বুঝি ভারতের জন্যই ইস্তেহারে এইসব কথা লিখে গেছেন। পশ্চিমী বুর্জোয়াদের ধাঁচায় খাপ খাওয়াতে গিয়ে এদেশের অর্থ-ব্যবস্থার স্বাধীন বিকাশ তো হয়ই

নি, এমনকি জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় স্বকীয়তার নিদারুণ অভাব রয়ে গেছে। আর সেকারণেই এদেশকে বিশ্বায়ন নামক পুঁজির দিগ্বিজয় রথের সাথে জুড়ে দেওয়া সহজ হয়েছে। যা দেশবাসীকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে বুর্জোয়া উন্নয়নের পথে। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত বাস্তুচ্যুত মানুষ এগিয়ে চলেছে এক সর্বনাশা পরিণতির দিকে।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এদেশের বুর্জোয়াদের স্বাধীন শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেয় নি, আর ঔপনিবেশিক দাসত্বের চিহ্ন রয়ে গেছে শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গে (ইংরেজি না বললে যাদের 'জাতে' ওঠা যায় না, আর স্বাধীন চিন্তা আর মতপ্রকাশ যাদের ধাতে নেই)। এই পঙ্গু পুঁজিতন্ত্রে শ্রমিকরা রয়ে গেছেন আধা-শ্রমিক (যাদের এক'পা শহরে তো আরেক'পা গ্রামে)। সেকারণেই সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণিকে শুধু সাংগঠনিকভাবে নিরস্ত্র করা গেছে তাই নয়, বেশিরভাগ শ্রমজীবিকে ঠেলে দেওয়া গেছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। তারপর নিরাপত্তাবিহীন সস্তা শ্রমের বিপুল ভাণ্ডার সামনে রেখে আর শ্রম-আইনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে দিশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির রমরমা কারবার ফুলেফেঁপে ওঠার পথ মসৃণ করা হয়েছে।

কিন্তু শুধু দৈহিক শ্রম-লুণ্ঠনেই পুঁজির কেরামতি সীমিত নেই, প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ বিশ্বপুঁজিকে ক্রমেই আগ্রাসী করে তুলেছে, ভারতের মতো দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিংড়ে নেওয়ার নানান বন্দোবস্ত বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। সর্বাধিক দ্রুত বিকাশমান আইটি সেক্টরে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক-যুবতী বহুজাতিক পুঁজির সেবায় দিনরাত এক করে প্রাণপাত করে চলেছেন। ১২-১৬ ঘন্টা কাজ যেখানে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে বসে তাঁরা বিদেশি কোম্পানীকে সস্তা শ্রম যুগিয়ে চলেছেন।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ বাড়তে বাড়তে এখন 'ফেল কড়ি মাখো তেল' এটাই সাধারণ নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিগ্রি অর্জন এখন শধু অর্থ বিনিয়োগের বিষয়। তো লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ডিগ্রি নিয়ে কেউ জনসেবায় মন দেবে, এটা কিকরে হয়। তাই সবাই বেসরকারী পুঁজির সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করছে, যেখানে মজুরী-দাসত্বের নিয়মগুলো বেশ পাকাপোক্ত বলবৎ করে তোলা হয়েছে। এখন তো সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও ভারতীয় শাসকরা ঠিক করে দিচ্ছেন কোন বিষয়ে গবেষনা করতে হবে। শিক্ষিত মানুষ যে কতরকম দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ, তা দেখার জন্য ভারতবর্ষ এক আদর্শ ক্ষেত্রই বটে!

অন্যদিকে, দেশের সম্পদ ঢালাও বেচে দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেট পুঁজির কাছে (যারা অনেকে দেখতে দেশি হলেও বিদেশি পুঁজি আর প্রযুক্তির ওপর তাদের নির্ভরতা তাদের দোআঁশলা করে দিয়েছে)। সেকারণেই বোধকরি এদেশের পুঁজিপতি আর সরকারের এতটুকু হাত কাঁপেনা

দেশের জল-জঙ্গল-জমির ওপর স্বদেশী মানুষের চিরাচরিত অধিকার ছিনিয়ে নিতে, পিতৃ-পুরুষের বাসভূমি থেকে তাদের উৎখাত করতে। পাহাড়-জঙ্গল-আবাদভূমি উজাড় করে প্রাকৃতিক সম্পদ লুটের ইজারা কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দিতে। মনে আছে, বামফ্রন্ট সরকার নন্দীগ্রামের হাজার হাজার একর জমি তুলে দিতে চেয়েছিল কোন এক ইন্দোনেশীয় কোম্পানীর হাতে।

দেশের মানুষ আর দেশের সম্পদকে অবাধ লুণ্ঠনের উপযোগী করে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভবনের কথাও মার্কস-এঙ্গেলসই বলে গেছেন। বস্তুত, ইস্তেহারের ছত্রে ছত্রে আমাদের দেশে ঘটে চলা পরিবর্তনগুলোকেই যেন চাক্ষুষ করছি,

> *জনসমষ্টিকে এরা পুঞ্জিভূত করেছে, উৎপাদনের উপকরণগুলোকে করেছে কেন্দ্রীভূত, সম্পত্তিকে জড়ো করেছে অল্প কিছু লোকের হাতে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ, আইন-কানুন, শাসন-ব্যবস্থা অথবা কর-প্রথা সম্বলিত স্বতন্ত্র কিংবা শিথিলভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলোকে ঠেসে মেলানো হয় একেকটা জাতিতে, যাদের একই শাসনতন্ত্র, একই আইন-সংহিতা, একই জাতীয় শ্রেণি-স্বার্থ, একই সীমান্ত এবং একই শুল্ক-ব্যবস্থা।*

ওপরের কথাগুলো দেখে মনে হচ্ছে আজকের ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে যেন কেউ লিখে গেছেন। বর্তমান হিন্দুত্ববাদী সরকার যেভাবে এদেশে রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন ঘটিয়ে নানা ভাষা নানা মতের সকল বৈচিত্র ঘুঁচিয়ে আপামর ভারতবাসীকে হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তানের খাঁচায় পুরতে চাইছে, তার আসল উদ্দেশ্য যে এই বিশাল দেশে বিশ্ব-পুঁজির লীলাখেলার ক্ষেত্রটা আরও উন্মুক্ত করা, সেটা জাতীয় সম্পদ বেচার হিড়িক দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

এতসব কিছু চোখের সামনে ঘটে চলেছে, লকডাউনের নামে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংকটে ছেয়ে গেছে, কিন্তু উচ্চবর্গ নিরাপদেই আছেন। আমরা মধ্যবিত্ত দু'পাতা পড়ে আর কিছুদিন সংগঠন করে ছটফট করি। চলতি অবস্থাটা না পারি গিলতে, না পারি উগড়াতে। তবু মার্কস-এঙ্গেলস থেকে ভরসা পাই। পুঁজিবাদ-উত্তর সমাজের খোঁজে নিম্নবর্গ সর্বহারা, আধা-সর্বহারা আম-জনতার দিকে তাকাতে তাঁরাই তো শিখিয়েছেন।

সংগঠিত বনাম অসংগঠিত শ্রমিক

মার্কসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে পার্থবাবুর একটা বড় প্রশ্ন অবশ্য সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা নিয়ে। তিনি বলেছেন, *অনেকে বলছে পুঁজির অধীন যে সংগঠিত শিল্প-বানিজ্য ক্ষেত্র, মালিক-শ্রমিকসহ তা আজ সামগ্রিকভাবে বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ*

সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বা কৃষকের স্বার্থের কোনো মিল নেই। বোঝাই যাচ্ছে, এই বক্তব্যে তাঁর সমর্থন আছে।

হ্যাঁ সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির যে ভূমিকা মার্কস তাঁর সময়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা বুর্জোয়া সমাজের বিকল্প খোঁজে তাঁকে করতে প্রাণিত করেছিল, সেই ভূমিকা আজ অনেকাংশেই অনুপস্থিত। আর এদেশে তো তা খুঁজতে যাওয়াই বেকার। এই মূহুর্তে এদেশের সংগঠিত-অসংগঠিত শ্রমিকরা কেমন আছেন, কীভাবে তাঁরা মালিক শ্রেণির আক্রমণের মোকাবিলা করছেন, সেতো বিস্তৃত অনুসন্ধান ও গবেষনার বিষয়। কিন্তু সংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থ অসংগঠিত শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এই তথ্য পার্থবাবু কোথায় পেলেন? আজকের দিনে সংগঠিত আর অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে যে কোন চিনের প্রাচীর নেই, সেটা অনেক তথ্য দিয়ে প্রমান করা যায়। কিন্তু সেটা পৃথক আলোচনার বিষয়।

আজকের সময়ের নির্মম সত্য হচ্ছে, সমাজের প্রায় সকল শ্রমজীবি, ছোট ও মাঝারি কৃষক থেকে শুরু করে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক, ব্যবসায়ী বা শিক্ষিত মেধাজীবি--- সমাজের প্রায় সকল অংশ কর্পোরেট পুঁজির হাতে কোন না কোনভাবে নিপীড়িত হচ্ছেন। কেউ নিজ পেশা থেকে উৎখাত হয়ে যাচ্ছেন, কারুর ওপর শোষনের মাত্রা লাগামছাড়া হচ্ছে, কেউ বা নিজভূমে পরবাসী হয়ে পড়ছেন। অতি-মুনাফার নেশায় উন্মত্ত পুঁজি (আর তার সেবাদাস সরকার) নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যতে তালাচাবি মেরে কর্ম-সংকোচনকেই নিয়ম করে তুলেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, পুঁজির দৌরাত্মে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন মানুষের মধ্যে ঐক্যই তো স্বাভাবিক প্রবণতা হওয়ার কথা। কিন্তু আসলে সকল বঞ্চিত-পীড়িত মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য একটা মঞ্চ লাগে। মার্কস-এঙ্গেলস সেই ১৭০ বছর আগে তেমন একটা মঞ্চ গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন, শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সংঘ, যা প্রথম আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস পরবর্তী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নিজ নিজ দেশের শ্রমিকদের বুর্জোয়াদের দুনিয়া ভাগ-বাটোয়ারার যুদ্ধে সামিল করে দিলে, দেশ আর জাতির নামে শ্রমজীবি মানুষকে বিভক্ত করে ফেললে। সেই থেকে শুরু হয়েছে সমাজের বিভিন্ন নিপীড়িত অংশগুলোর পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে একত্র হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতাকে অন্তর্ঘাত করার নানা কৌশল। সেই বদমাইশিতে সামিল হয়েছে তথাকথিত বামপন্থীরাও।

এই সংকট মূহুর্তে সাধারণ মানুষ যত বিপন্ন হয়ে পড়ছে, শাসকদের তত দরকার পড়ছে কড়া ডোজের দাওয়াই---ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে, কোথাও বা বহিরাগতের নামে চলছে

নিপীড়িত মানুষের মধ্যে পাঁচিল তোলার কাজ---ভারত থেকে আমেরিকা সর্বত্র দক্ষিনপন্থাই শাসকদের শেষ আশ্রয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এটা পুঁজির সার্বিক সংকট ছাড়া আর কিসের লক্ষণ? কমিউনিজমের ভূত তাড়াতে যে উদার গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি দেওয়া হয়েছিল, তা তো ক্রমেই শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে!! শাসকদের দাঁত-নোখ যেভাবে প্রকাশ্যেই প্রদর্শিত হচ্ছে, যেভাবে আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষ পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে, তাতে কি এটা স্পষ্ট হচ্ছে না যে, আজকের বিশ্বায়ত বুর্জোয়া ব্যবস্থাটা ঠিকঠাক চলছে না! গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে পড়লে নিছক ডান্ডাবাজির জোরে ব্যবস্থাটা পোক্ত থাকবে কি? আর প্রশাসনিকতার তত্ত্ব যে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে!!

এমনটা কি চলবে চিরদিন?

এখন কেউ যদি মনে করেন, পুঁজির এই লীলাখেলা এমনই চলবে চিরকাল, তাঁরা আসলে দেখতে পারছেন না, পুঁজি কীভাবে উত্তরোত্তর সমগ্র মানব-জাতির সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে, সমগ্র মানব-সমাজকে ধংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, যার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা পুঁজির আধিপত্যের অবসান। যদিও এই মূহুর্তে কোন শক্তি দেখা যাচ্ছে না যা পুঁজির এই আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। কিন্তু সমস্যা তো তার গর্ভে সমাধানের উপায় নিয়েই আসে। পৃথিবীজুড়ে এমনসব কাণ্ড-কারখানা কি ঘটছে না, যা কিছুদিন আগেও ছিল অচিন্তনীয়?

কেউ কি ভাবতে পেরেছিল, পুলিশের হাতে একজন মানুষের মৃত্যুকে ঘিরে এমন বর্ণ-বিদ্বেষ-বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়বে আমেরিকা-ইউরোপজুড়ে! এদেশেই বা কে ভেবেছিল ধর্মীয়-বিভেদমূলক নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস এমনভাবে নারী-সমাবেশ দিল্লির রাজপথে শুরু হয়ে ভারতের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে! বা বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে পরিবেশ-রক্ষার আন্দোলনে জেগে উঠবে শিল্পোন্নত দুনিয়ার কচি-কাঁচারা, ‘পরিবেশের জন্য শুক্রবার’ ধর্মঘট উদ্বেল করে তুলবে ইউরোপ থেকে বিশ্বের নানা প্রান্ত। না, এর কোনটাই সরাসরি পুঁজির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছেনা বটে, কিন্তু বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন সামাজিক শক্তির জন্ম দিচ্ছে। সংকট যেমন যেমন বাড়বে, আমরা কেউ জানিনা আরও কত নতুন শক্তির উত্থান হবে দুনিয়াজুড়ে।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষনীয়। এক, পুঁজির আগ্রাসী থাবা থেকে দুনিয়াকে মুক্ত না করে এই নব্য সামাজিক আন্দোলনগুলোর লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়। এই যে জাতিবাদ, বর্ণবাদ, বা ধর্মান্ধতার রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষ পথে নামছেন, এসবই তো পুঁজির আগ্রাসন থেকে সাধারণ মানুষের

নজর সরিয়ে রাখা আর নিপীড়িত মানুষকে বিভক্ত করার হাতিয়ার, যা যুগে যুগে শাসক শ্রেণি ব্যবহার করে এসেছে। যারা লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান চান, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় খুব বেশি হলে তাঁরা যৌনতার উন্মুক্ত বাজার দাবি করতে পারেন, যৌন-দাসত্বের অবসান নয়। কারণ পুঁজির কাছে আর পাঁচটা জিনিসের মতন যৌনতাও একটা পণ্য বই কিছু নয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন বা পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনেও প্রধান প্রতিপক্ষ শেষ বিচারে পুঁজিবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

দুই, একবিংশ শতকের এই নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে কোন দল বা নেতা ছাড়াই সংঘটিত হচ্ছে। এর আগে আমরা আমাদের দেশে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে জমি-অধিগ্রহন-বিরোধী যে আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল (আজও যে লড়াই জারি আছে নিয়মগিরি বা অন্যত্র), সেসবই ছিল সরকার আর বৃহৎ পুঁজির আক্রমণের মুখে কোন দল বা নেতা ছাড়াই সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলন। পরে কোনও শাসক দল এসে তার ফায়দা তুলেছে, সেটা পৃথক ব্যাপার। কিন্তু বিংশ শতকে যেমন দল-পরিচালিত আন্দোলন দেখতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, একবিংশ শতকের জন-আন্দোলনগুলো কিন্তু দলীয় কেন্দ্রীকতাকে একপ্রকার বর্জন করেই বেড়ে উঠেছে। মার্কিন দেশে বর্ণ-বিদ্বেষ-বিরোধী আন্দোলন থেকে এদেশে এনআরসি-বিরোধী জমায়েত, বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলন থেকে আরব বসন্ত বা অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট---বহু আন্দোলন ঘটে চলেছে কোন নেতা বা দল ছাড়াই।

সন্দেহ নেই, পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গত শতকে হয়েছে, তা শুরুতে বিশ্বজুড়ে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি করলেও অন্তিমে সেই ব্যবস্থা তার বিপরীতে পরিণত হয়েছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি পুঁজিবাদের বিকল্প কেমন হওয়া উচিত, তার থেকে বেশি কেমন হওয়া উচিত নয়, বোধকরি তারই শিক্ষা রেখে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব নামক যে বিষয়টি একদা যেকোন প্রগতিশীল আন্দোলনের অনিবার্য শর্ত হিসেবে আমরা দেখতে শিখেছিলাম, ব্যাতিক্রমহীনভাবে তার অধঃপতন একটা সূত্র রেখে গেছে। সম্ভবত একারণেই নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো আর কোন পার্টির দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না।

মার্কস-এঙ্গেলস ‘কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার’ রচনা করে গেলেও কমিউনিস্ট পার্টির যে রূপ আমরা দেখতে অভ্যস্ত, তা তাঁরা চোখে দেখেন নি। তাঁদের বিকল্প সমাজ-ভাবনার কেন্দ্রে ছিল পার্টি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবসান। নতুন রাষ্ট্র কেমন হবে তার সূত্র তাঁরা খুঁজেছিলেন প্যারী কমিউন থেকে, যে কমিউনে রাষ্ট্র আর আগের মতো শাসন-যন্ত্র হিসেবে টিকে থাকবেনা, তা শুকিয়ে মরতে শুরু করবে। অথচ ক্ষমতায় আসার পর মার্কস-অনুগামীরা ভয়ংকর রকম

কেন্দ্রীকতার জন্ম দিল, পার্টি আর রাষ্ট্র হয়ে উঠল সকল ক্ষমতার আধার। যা অনিবার্যভাবে মার্কসীয় ভাবনার বিপরীত দিকে চলে বিকল্প ব্যবস্থা নির্মানের সমস্ত সম্ভাবনাকেই নির্মূল করে দিল। এর প্রভাব এতটাই হল যে, নতুন প্রজন্মের কাছে সাম্যবাদ সমাজতন্ত্র কথাগুলো কিছু নেতিবাচক দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু তুলে ধরেনা।

মার্কস-এঙ্গেলস তৎকালীন সামাজিক আন্দোলনগুলো থেকে রসদ সংগ্রহ করেই বিকল্প সমাজের রূপরেখা বানাতে চেয়েছিলেন। নতুন শতকে নবোদ্ভূত সামাজিক আন্দোলনগুলো অন্তত এটা বোধহয় জানান দিয়েছে, কেন্দ্রীভূত পার্টি নতুন সমাজ গড়ার প্রশ্ন তো দূরের কথা, সামাজিক আন্দোলনগুলোতেও প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জী ভারতের কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী রাজনীতির প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট ইস্তেহারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল ভারতের রাজনীতিতে (শুধু কি ভারত?) কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীরা কেন উত্তরোত্তর অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছেন? কেন বামপন্থী দলগুলোর অনুগামীরা আজ বিপুল সংখ্যায় হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পক্ষপুটে আশ্রয় নিচ্ছেন? দেশজুড়ে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের ভয়ংকর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার উপায় আছে কি??

পার্থ সারথি

ইমেল- psb3210@gmail.com